কলকাতার বাবু

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় ইংরেজ বণিকদের আবির্ভাবের পর শেঠ, বসাক, মল্লিক, সরকার, মিত্তিররা তাঁদের সঙ্গে ব্যবসা ও চাকুরিতে লিপ্ত হন। এঁরাই জোব চার্ণকের সূতানুটির প্রথম বাসিন্দা ও পরবর্তী যুগের বাঙালি বাবুদের আদি পুরুষ। ইংরেজরা তখনও সামান্য বণিক। তখনও তাঁদের ভাগ্যাকাশ একাদশে বৃহস্পতি হতে বাকি। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় পলাশীর যুদ্ধ নামক রঙ-তামাশার পর সুবে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব যুবক সিরাজউদ্দৌলা, ক্লাইভ-মীরজাফর-উমিচাঁদদের হাতে বলি হন। ভারতের অন্যান্য জায়গার মত বাংলায়ও তখন বড়ই অরাজকতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন তখন ''মীরজাফর গুলি খায় আর ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে আর জেসপ্যাচ লেখে। বাঙালীরা কাঁদে আর উৎসন্ন যায়... মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই ঝি-বউদের পেটে—ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই।''

এহেন অরাজকতার কালে ইংরেজরা আস্তে আস্তে বাংলার মসনদ অধিকার করে মিলেন। ক্লাইভ, হেস্টিংস ও পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা কোম্পানির সাম্রাজ্যের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে লাগলেন। তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক দেওয়ান, মুন্সী, বেনিয়ান মুৎসুদ্দি, তহবিলদার ও তল্পিবাহক হয়ে কায়স্থ, নানা বর্ণের বাঙালীরা বড় মানুষ ও সমাজের শিরোমণি হয়ে দাঁড়ালেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন লক্ষীকান্ত বা নকুধর, কান্তবাবু, নবকৃষ্ণ মুন্সী, গঙ্গাগোবিন্দ সিং ও দেবী সিং যাঁরা পলাশীর যুদ্ধের দু-চার বছর আগে পর্যন্ত নামগোত্রহীন ছিলেন। কলকাতার পত্তনের প্রায় একশ বছরের মধ্যে এই আজব শহর টাকা রোজগারের কারখানা হয়ে দাঁড়ায়। সেই কলকাতায় কোম্পানির আওতায় বনেদী রাজা-মহারাজারা ফৌত হয়ে গেলেন আর মুদি-মুন্সীরা রাজা-মহারাজা হয়ে দাঁড়াল। কান্তবাবুর বাংশধররা হলেন কাশিমবাজারের মহারাজা। নকুধরের দৌহিত্ররা হলেন পোস্তাব রাজা, নব মুন্সী শোভাবাজারের মহারাজা ও পাঁচ হাজার মনসবদার হলেন, আর গঙ্গাগোবিন্দ হলেন পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁদেরই সময়ে কৃষ্ণপান্তি (যাঁরা সম্বন্ধে রামপ্রসাদ লিখেছেন 'ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি তারে দিলে জমিদারি), রামদুলাল সরকার, জানবাজারের মাড়েরা ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে লাগলেন। কান্তবাবু, নবমুন্সী ইত্যাদি লোকের অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া সঙ্গে সঙ্গে ছলে বলে কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি করা তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। অতএব এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে তাঁরা বিত্তহীন ও তথাকথিত কুলোদ্ভব হয়ে আর্থিক উন্নতির চরম শিখরে উঠে সমাজের গোষ্ঠীপতি হয়েছিলেন। রাজারাজড়াই হন বা বড়লোকই হন, ক্ষমতায় কায়েম থাকতে হলে সাধারণ লোকদের তাক লাগাবার জন্য নানারকম আধার ও আড়ম্বরের দরকার, এমন রোশনাই চাই যাতে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কলকাতার প্রথম বাবুদের এ ব্যাপারে কোনও ত্রুটি ছিল না। নবাবী বাড়ি, সৌখিন আসবাদ, দাস-দাসী, সাত-পত্নী ও উপপত্নী, চৌঘুরি, রূপোর তাঞ্জাম, রাস্তায় হাতি ঘোড়ার সওয়ার, রূপোর ময়ূরপঙ্খী, খানাপিনা, বাগানবাড়ি কিছুরই কমতি ছিল না। নবমুন্সীর কথাই ধরা যাক তাঁর বাড়িতে দুর্গোৎসবে স্বয়ং ক্লাইভ ও হেস্টিংসও উপস্থিত থেকেছেন। পাঁচ হাজারী মনসবদার হিসেবে তাঁর ছেলের বিয়েতে চার হাজার পলটন হাজির ছিল শোনা যায়। তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ন-লক্ষ টাকা খরচ করে ভূ-ভারতের ব্রাহ্মণ ভোজন ও দানসাগরী দিয়ে বিদায়— প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছে। নিচু জাত হলেও নবকৃষ্ণ প্রমুখ সমাজের শিরোমণিদের দাপটে বৃত্তিভোগী জন্মফলারে বামুনেরা আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়েছিলেন এবং বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে জাল, জুয়াচুরি, মিছে কথায় পরাঙ্মুখ না হলেও এঁরা অন্যদিকে সাত্ত্বিক হিন্দুমতে বিশ্বাসী ছিলেন। বারো মাসে তেরো পার্বণ, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, গঙ্গাস্নান, জপতপ, সন্ধ্যাআহ্নিক এঁদের কোনও কিছুই বাদ যেত না। আর মৃত্যুর আগে গঙ্গা না পেলে এঁরা মরেও শান্তি পেতেন না। চূড়ামণি দত্তর সঙ্গে নবকৃষ্ণর জীবিত অবস্থায় রেষারেষির কথা সকলেই জানেন। এর জের চূড়ামণি দত্তর অন্তর্জলী যাত্রা অবধি চলে। তাঁকে যখন গঙ্গাযাত্রা করানো হয় তখন তাঁর লোকেরা নবমুন্সীকে টিটকিরি দিতে দিতে এই গান গাইতে গাইতে যান:

''যম জিনিতে যায় রে চুড়ো,
যম জিনিতে যায়।
জপতপ করলে কী হয়,
মরতে জানতে হয়।।''

হুতোমের ভাষায় সময় কারুর হাত ধরা নয়। নদীর স্রোতের মত, মানুষের পরমায়ুর মত, বেশ্যার যৌবনের মত সময় কারুর তোয়াক্কা করে না। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পড়ল। কোম্পানির আমলের আদিবাবুর দল গত হতে লাগলেন। তাঁদের স্থান তাঁদের পুত্র - পৌত্ররা-প্রপৌত্ররা অধিকার করলেন। কোম্পানির প্রতিপত্তি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে বাবু সম্প্রদায় সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ব্যাঙের ছাতার মতন বড় বাবুরা গজিয়ে উঠতে লাগলেন। আদি বাবুদের বংশধরদের তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতন বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা ছিল না, এবং জীবন - ধারণের জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল না। নতুন বাবুদের একটা প্রধান কাজ সাহেবদের মনস্তুষ্টি। ফলে উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই কলকাতা কমলালয়ের বাবু কালচার শতদল পুষ্পের মতন ফুটে উঠতে লাগল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম, ভোলানাথ শর্মা, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, মাইকেল, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসুকে বটতলার অজানা নক্সা ও ছড়া লেখকরা ছাপার অক্ষরে বাবু ও বিবিদের কীর্তিকলাপ চিরদিনের জন্যে জলজ্যান্ত করে রেখে গেছেন।। মোসাহেবরূপী জানোয়ার - পরিবৃত বাবুদের জীবনযাত্রাপ্রণালী, গাজন, দোল, দুর্গোৎসব, রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, রামলীলা, হাফ আখড়াই ফুল আখড়াই, কবিগান, তর্জা, বড় বড় পরবে, ছেলের বিয়েতে মায় ভাগনের কান ফোঁড়ায় সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়ে সাহেব বিবিদের আপ্যায়ন, বুলবুলির লড়াই, বেশ্যা ও রক্ষিতা নিয়ে এবং আবগারির সমস্ত ব্যবস্থাসহ পরবে বজরায় ও বাগান বাড়িতে, বেহদ্দ ফুর্তি ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা এঁদের লেখা থেকে এতবার উদ্ধৃত হয়েছে যে, এখানে তার পুনরাবৃত্তির দরকারও নেই আর জায়গাও নেই। তবে এঁরা যে মজা লোটার ব্যাপারে বয়সের তোয়াক্কা করতেন না, সে সন্ধানে হুতোমের একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। হুতোম বলেছেন : অনেক বুড়ো মিনসে হয়েও হীরে বসান টুপি কারচোপের কর্মকরা কাবা, গলায় মুক্তোর মালা, দুহাতে দশটা আংটি পরে 'খোকা' সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না, হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়ষ ষাট বৎসর— ভাগনের চুল পেকে গেছে।

এখানে বলা দরকার, বাবুদের নিয়ে যাঁরা মস্করা করছেন আর সপাং সপাং করে তাদের পিঠে চাবুক কষেছেন, তাঁরাও সব বাবুই ছিলেন। ভবানীচরণ ডকেট কোম্পানির মুৎসুদ্দি ও পরে মেজর জেনারেল ইউলিমায় ক্যারির মুৎসুদ্দি ইত্যাদি কাজ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

নিমতলার প্যারিচাঁদ মিত্র ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হয়ে কাজ করেন ও পরে ব্যবসায়ে বহু রোজগার করেন। হুতোম তাঁর কলকাতার চড়কপার্বণে যে বাবুর বংশ - কুলুজির কথা বলেছেন তা তাঁর নিজের বেলায় হুবহু খাটে। সেই বাবুর মতনই তাঁর প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস রাম বোল্ড ও মি. মিডলটনের অধীনে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানী করে বনেদী করলাম। অন্যদের বংশ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। লেখা ছাড়া ও বাবুদের অন্য ভাবেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। যেমন কালীঘাটের পটে এবং পরে চিৎপুরের উডকাটে। কালীঘাটের পটে প্রধানত বাবুদের বিবি বিলাসের ব্যাপারটাই প্রাধান্য পেয়েছে। কোনও পটে দেখা যায় নধরকান্তি সুদর্শন বাবু তাঁর রক্ষিতার গলা জড়িয়ে আছেন, কোনও পটে বাবু গুরু নিত্যম্বিনী লাস্যময়ী পেয়ারের মেয়ে মানুষের পদসেবা করেছেন, কোথাও দেখা যায় আধা - মানুষ আধা - ঘোড়ারূপী বাবু উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। আবার অন্যত্র সেই বাবুকে দেখা যাচ্ছে ভেড়ারূপে, যাঁকে একজন যুবতী বকলস বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া পটে আরও দেখা যায় নববিবি মুকুর হস্তে প্রসাধনরতা। গোলাপ সুন্দরী তরলা সুন্দরী বীণাবাদিনী ইদ্যাদি বিদ্যাধরীরা বাবুদের সন্ধ্যায় দুদণ্ড আয়েস দেওয়ার জন্য অপেক্ষমানা। কালীঘাটের অশিক্ষিত পটুয়াদের মতন অনেক কবিয়ালও বনেদী বাবুদের ছেড়ে কথা বলতেন না। যেমন ভোলা ময়রা তাঁর এক বিখ্যাত গানে অনেক প্রবল প্রতাপশালী বাবুদেরও চাবুক কষিয়েছিলেন, যার থেকে বোধহয় মাথা ব্যক্তিরাও বাদ যাননি।

মোষের মতন মুনসী বাবু,
মোষের মতন কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙায়,
চেহারাখানা ভালো।।

সাহেবের অধীনে চাকরি ও সহবৎ লাভ করলেও বাবুদের অধিকাংশই ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি শিক্ষায় একেবারেই দড় ছিলেন না। বাবু শব্দের নানান অর্থের মধ্যে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশেনারিতে একটি মানে হল, এ বেঙ্গলী উইথ ও সুপারফিসিয়াল ইংলিশ এডুকেশন। বাবুদের ইংরেজি-জ্ঞান ও আচার -ব্যবহার নিয়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহিত্যে অগুনতি বই, আর ইন্ডিয়ান চ্যারি ভ্যারি জাতীয় পত্রিকায় লেখায় ও ছবিতে যে মর্মান্তিক ঠাট্টা আছে, তা পড়লে আজও কান লাল হয়ে যায়। আসলে বাবুদের ইংরেজিপনা ছিল সবই বাইরের ব্যাপারে। তাঁদের প্রাসাদোপম অট্টালিকার করিন্থিয়ান ডরিক থামে, বাগানের ফুলের কেয়ারী ও বোর্নিনির ফোয়ারার প্লাসটার অফ প্যারিসে কপিত আর ডোনাটেলোর নগ্ন ক্রাউটিং ভিনাসের প্রতিমূর্তিতে, টুলোর নিলাম ঘর থেকে কেনা বৈঠকখানার বিলিতি ফার্নিচার, কার্পেট, ভিনিসিয়ান কাটক্লাসের ঝাড়ের, অরমলু করা ঘড়ি, অপঠিত বাঁধানো বিলাতি বই ভরা লাইব্রেরিতে ও ওয়াটার ফোর্ডের কাটক্লাসে ক্লারেট ও বুরগাণ্ডি পানে, ল্যাণ্ডো ও ব্রুহামে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যে টুলো কোম্পানিতে রামদুলাল সরকার ডোরা জাহাজ ধরে রাতারাতি লক্ষপতি হয়েছিলেন তাঁর ছেলেরা ও অন্যান্য বাবুরা সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ভরাডুবির দিকে এগিয়ে গেছেন। সে যাই হোক এমন কি বাবুদের বাড়ি স্থাপত্যের বাইরেটা নিওক্লাসিকাল ধরনের হলেও ভেতরটা ছিল বাঙালি। বাইরে বাড়ির একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ ছিল বিরাট পুজোর দালান। অন্দরমহলে থাকত বিরাট উঠোন, যেখানে মেয়েরা বড়ি, আচার, আমসত্ত্ব দেওয়া ছানা মেয়েলি পালা ব্রত ইত্যাদি পালন করতে পারতেন। ছাতে থাকত চিলেকোঠা, যেখানে শুয়ে মেয়েরা হয়ত দুপুরবেলায় ভিজে চুল শুকুতে পারতেন। মেয়েদের কথা ছেড়ে দিলেও পোশাকে আসাকে বাবুরা কখনই সাহেবী হননি। যদিও অনেকে ছেলেদের সাহেবী পোশাক পরাতেন। হুতোম বর্ণিত বুড়ো মিন্‌সের খোকা সাজার টুপি ও কাবা ইত্যাদি পারস্য পোশাক তাই বাবুদের প্রিয় ছিল। ১৯ শতকের বাবুদের অয়েল পেনটিংয়েও তাই দেখা যায়। মোগলপাঠানদের সঙ্গে ছ'শ বছর ঘর করার পোশাক - আসাক চলন -বলনের ওপর প্রভাব একদিনে যায় না।

কলকাতায় বাবু কালচারের রবরবা গত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে হ্রাস পেতে শুরু করে। বাবুদের কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম সুন্দরী পুরীগুলোর দেউটি একে একে নিভে যেতে লাগল, সাজানো বাগান ও সাধের ফোয়ারা শুকিয়ে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের সামাজিক প্রতাপ ও ব্যবসা-ব্যাণিজ্যের যে গুরুত্ব ছিল তাও শেষ হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বাবুয়ানী তখনও একেবারে লোপ পায়নি। জমিদারী ও নাগরিক সম্পত্তির আয়ের ওপর নির্ভর করে ঘড়ার জল গড়িয়ে খেয়ে কিছু কিছু বাবু তাঁদের নবাবীপনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। আমাদের ছেলে বয়সে দেখেছি সিমলের এক বাবুর বাড়িতে পুরনো দিনের বাবু কালচারের শেষ রেশ। দাস - দাসীতে ভরা বিরাট বাড়ি, পুজো পার্বণে ধুমধাম, বাড়িতে চিড়িয়াখানা, কর্তাদের দাপট, সপ্তাহান্তে কর্তাদের বাগানবিহার। এসব চলত বিশ-তিরিশটা বাড়ির আয় আর কোম্পানির কাগজের সুদ থেকে। আজ তাঁদের বংশধররা ভাঙা বাড়িতে থাকেন আর অপিসে কলম পিষে সংসার চালান। চিৎপুরের কিছু নামী বংশের জীবনধারণের পুরনো কেতা দেশভাগ অবধি বজায় ছিল। আজ তাঁদের অনেকেরই দৈন্যের দশা। তবে আমাদের কাছে বাবুদের শেষ প্রতীক ছিলেন একজন, যাঁকে গত মহাযুদ্ধের ঠিক আগে ঘড়ির কাঁটার মতন প্রতি সন্ধ্যায় 'হুড-খোলা রোলস' বা মিনার্ভায় চড়ে লেকের চারপাশ ঘুরতে দেখা যেত। মটর গাড়ি চলত আস্তে আস্তে আর সাদা গিলে করা পাঞ্জাবী পরা পটের বাবুর মতন চেহারার ভদ্রলোক চুপ করে পেছনে বসে থাকতেন, পাশে পাতাকাটা - চুল স্ত্রীকে নিয়ে। তিনি এক মল্লিক বাড়ির শেষ প্রতিনিধি। শুনেছি তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আত্মঘাতী হন।

বাবুদের পতনের গূঢ় কারণগুলির হয়ত সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির গণ্ডিতরা সঠিক হদিশ দিতে পারেন। আমরা আমাদের সেই কর্তব্য সারব কবিওয়ালার এই গান দিয়ে :

দুর্গাপূজা ঘন্টা নেড়ে,
খোকা হলে বাজে ঢাক।
কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে
খাঁচায় পুল্লেন নাকি কাক।।
বিষয়-কম্ম গোল্লায় গেল
লড়িয়ে কেবল বুলবুলি।
প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে
মরে গেল লোকগুলি।।